Vol. 60 | No. 1-2 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ও ব্রজাঙ্গনা কাব্য: রাধার বিরহ চিত্রণের রূপভেদ

| | |
|---|---|
| Volume | 60 |
| Issue | 1-2 |
| Year | 2025 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Supriya Rani Das |
| Published online | August 21, 2025 |
| DOI | 10.62328/sp.v60i1-2.6 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v60i1-2.6 |
| Pages | 91-106 |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

# সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩১॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i1-2

DOI: 10.62328/sp.v60i1-2.6
প্রবন্ধ জমাদান: ১১ জুন ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ মে ২০২৫
পৃষ্ঠা: ৯১-১০৬

## *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও *ব্রজাঙ্গনা কাব্য*: রাধার বিরহ চিত্রণের রূপভেদ

**সুপ্রিয়া রানী দাস**
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: supriyabangla2511@gmail.com

**সারসংক্ষেপ**

বড়ু চণ্ডীদাসের *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও মধুসূদন দত্তের *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* দুই কালের ও মনোভঙ্গির দুই কবির কাব্য হলেও উভয় কাব্যের মূল সুর রাধা-কৃষ্ণের প্রেম এবং তৎসঞ্জাত রাধার বিরহ। দুটি কাব্যের রচনাকালের মধ্যে আনুমানিক প্রায় চার শতাব্দীর ব্যবধান। ফলে স্বভাবতই রাধার বিরহকে দুই কবি ভিন্ন ভিন্ন পর্যবেক্ষণে তাঁদের কাব্যে উপস্থাপন করেছেন। সমকালীন সমাজ-সময়-সংস্কৃতি-জীবনাচার, আধুনিক এবং পূর্বকালীন জ্ঞান ও বিশ্বাসের পার্থক্য তাঁদের কবিসত্তা আর কাব্যের চরিত্রায়ণে নিঃসন্দেহে প্রভাব রেখেছে। বড়ু চণ্ডীদাস যেখানে পূর্ববর্তী সংস্কৃত কাব্য, পুরাণ ও লোকজ বিশ্বাসকে নিজের কল্পনার মিশ্রণে কাব্যে প্রয়োগ করেছেন সেখানে ইংরেজ শাসনামলে ইউরোপীয় উন্নত শিক্ষার সংস্পর্শ ও পঠনপাঠন মধুসূদনের কাব্যাদর্শকে ভিন্নভাবে গড়ে তুলেছে। কাব্যে আদিরস ও শরীরী অনুষঙ্গ ব্যবহারের রকমভেদও দুই কবির রাধা-বিরহ বর্ণনের ক্ষেত্রে পার্থক্য সূচিত করেছে। দুই কবির অঙ্কিত রাধা চরিত্রেও পড়েছে কবিদ্বয়ের মননজাত পার্থক্যের ছাপ। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের 'অথঃরাধাবিরহ' খণ্ডে অন্য চরিত্রের উপস্থিতি ও সংলাপ রাধার বেদনাকে কোথাও বৃদ্ধি কোথাও-বা প্রশমিত করেছে। মধুসূদনের কাব্যে রাধার বেদনার সাক্ষী হয়েছে প্রকৃতি ও প্রকৃতির অনুষঙ্গ। বিরহবেদনা সেখানে সম্পূর্ণত রাধার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়েছে। দুই কবিই প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে রাধার বিরহ ব্যাকুলতাকে তাঁদের কাব্যে চিত্রায়িত করেছেন। মূলত পাঠ-বিশ্লেষণ ও তুলনামূলক পদ্ধতি অনুসরণ করে এই প্রবন্ধে বড়ু চণ্ডীদাস ও মধুসূদন দত্তের কাব্যদ্বয়ে রাধার বিরহদশা চিত্রণের ক্ষেত্রে এই দুই কবির সাদৃশ্য ও স্বাতন্ত্র্যকে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

**মূলশব্দ**

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, ব্রজাঙ্গনা কাব্য,* বড়ু চণ্ডীদাস, রাধা ও কৃষ্ণ চরিত্র, প্রেম ও বিরহ, রাধার বিরহ।

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যটি বাংলা সাহিত্যের আদি-মধ্যযুগের নিদর্শন। কাব্যটি আনুমানিক ১৪০০ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে বড়ু চণ্ডীদাস কর্তৃক বিরচিত হয়, যদিও এ নিয়ে নানা মতান্তর আছে। অন্যদিকে মধুসূদন দত্ত ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* রচনা করেন। উভয় কাব্যের মূল সুর রাধা-কৃষ্ণের প্রেম এবং কৃষ্ণের রাধাকে ত্যাগ করে মথুরায় গমনের ফলে রাধার জীবনে নেমে আসা ঘোর বিরহবেদনা। *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* মধুসূদনের সাহিত্যজীবনে বেশ ব্যতিক্রমী কাব্য বলা চলে। এখানে কবি তাঁর স্বভাবসুলভ তৎসম শব্দ ব্যবহার বা শব্দ নিয়ে নিরীক্ষা-প্রবণতা পরিহার করে সহজ ভাষায় কাব্যরস সঞ্চার করেছেন। মাইকেলের অধিকাংশ রচনা পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক কাহিনির ওপর ভিত্তি করে লেখা:

> কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তিনি এসবের মধ্য দিয়ে অতীত কালে অথবা দেবদেবীদের মন্দিরে ফিরে যেতে চাননি। অতীতের মালমশলা ব্যবহার করলেও, তা দিয়েই আধুনিকতার কথা বলেছেন। এই মানসিকতা ভারতীয় নয়, এটা ইউরোপীয় রেনেসন্সের ঐতিহ্য। দেবদেবীদের চিত্র অঙ্কন করেছেন, কিন্তু তাঁদের জয়গান করেননি, গৌরবান্বিত করেছেন মানুষকে, ইহলোককে। (গোলাম মুরশিদ ২০২৪: ১২২)

*ব্রজাঙ্গনা কাব্য* সেই নিদর্শনকেই বহন করে। বৈষ্ণব পদাবলি দ্বারা প্রভাবিত হলেও 'তিনি রচনা করেছিলেন দুরন্ত প্রেমের প্রবাহে 'মিসেস রাধা'র নিজেকে উজাড় করে দেওয়ার কবিতা। দেবদেবীর নামের আড়ালে মানব-মানবীর প্রেমের কবিতা হলো ব্রজাঙ্গনা। রোম্যান্টিক গীতিকবিতা হিসেবে অনবদ্য' (গোলাম মুরশিদ ২০২৪: ১২২)। সেই হিসেবে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের রাধা-কৃষ্ণের মানবিক প্রেমের সমগোত্রীয় বলে এই কাব্যকে চিহ্নিত করা যায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, মধুসূদনের জীবৎকালে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্য অনাবিষ্কৃত ছিল! বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক ১৯০৯ খ্রিষ্টাব্দে এটি আবিষ্কৃত ও ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয়। তাই মধুসূদনের কোনোভাবেই এই কাব্য দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। অন্যদিকে বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেব ও তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক কবিদের দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। সমালোচকের মতে:

> বাৎস্যায়নের কামসূত্র এবং সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের উদ্ভট শ্লোকাবলী ও আদিরসাত্মক কবিতার উত্তরাধিকার অবলম্বন করিয়াই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত। চৈতন্য-পরবর্তী বৈষ্ণবপদাবলীতে সেই আদিরস বহুল পরিমাণে সংযত এবং তাহা মধুর ও শান্তরসের আস্বাদ্যমানতা লাভ করিয়াছে। (অমিত্রসূদন ২০১৬: ৩৬)

ফলে যুগের প্রভাবে তাঁর কাব্যে সে কালের মানুষের রুচির প্রতিফলন ঘটতে বাধ্য:

> *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে পুরাণ, লোকপুরাণ-লোককথা, প্রাচীন প্রাকৃত-অবহট্‌ঠ সাহিত্য এবং *গীতগোবিন্দ* কাব্য যুগপৎ যেমন প্রভাব ফেলেছে, তেমনি উত্তরকালে রচিত *শ্রীকৃষ্ণবিজয়, গোপালবিজয়,* বৈষ্ণব পদাবলি ইত্যাদি সাহিত্যকর্মে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের বিষয় ও প্রকরণগত প্রভাব লক্ষ করা যায়। (উপল ২০০৯: ২৫)

তবে তাঁর কৃতিত্ব বা সমকাল থেকে স্পষ্ট স্বাতন্ত্র্য হলো তিনি রাধা-কৃষ্ণের দেবভাব বা দেবত্বকে অনেকাংশে পরিহার করে তাঁদেরকে সাধারণ মানব-মানবী হিসেবে চিত্রিত করেছেন। ফলে তাঁদের পরস্পর আকর্ষণ বা বিরাগও মানবীয়। মানবের মতোই রাগ-দ্বেষ,

হিংসা, বিবেকের পীড়ন, আফসোস এই কাব্যে দৃশ্যমান—'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কাহিনিটি রোমান্টিক প্রণয় কাহিনি রূপে সর্বদাই ব্যাখ্যাত হয়ে থাকে।' (শম্ভুনাথ ২০১১: ৫৯)

ফলে মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলিতে রাধাকে যেভাবে দেখানো হয়ে থাকে বা আধ্যাত্মিক ভাবধারার আধার হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, সেখান থেকে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা ব্যতিক্রম এবং তিনি অনেক বেশি মানবীয়। সমালোচকের মতে, 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পুরাণ ও লোককথার মিশ্রণ আছে' (ওয়াকিল ১৯৯৪: ৭)। পুরাণের গুরুগাম্ভীর্যের বাইরে কবি এক নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন এখানে। আর মাইকেলের *ব্রজাঙ্গনা কাব্যের* রাধা মাইকেলের অন্যান্য কাব্যের নারী চরিত্রের মতোই প্রধান। তিনিও পুরাণের ভাবধারা ও আধ্যাত্মিক মহিমা কীর্তনের বাইরে বেরিয়ে বাংলাদেশের সাধারণ কিন্তু মার্জিত নারী হিসেবে রাধাকে দেখিয়েছেন।

## দুই

রাধার বিরহ উভয় কাব্যের মূল সুর। তবে দুই কবির রাধার চারিত্রিক গঠন ও ক্রিয়াশীলতার মধ্যে মিল এবং পার্থক্য অনুসন্ধান এখানে আলোচ্য বিষয়। কৃষ্ণ যখন বাল্য ও কৈশোর লীলা শেষে পুরাণ কাহিনি অনুসারে কংস বধের দায়িত্ব পালনের জন্য বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা গমন করেন, তখনই রাধার সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়। এর দরুন রাধার জীবনে নেমে আসে অপার বিরহবেদনা। এই পৌরাণিক কাহিনির মূল বক্তব্যকে অক্ষুণ্ন রেখে যুগে যুগে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলা কাব্যে মূর্ত করেছেন:

> বাঙলাদেশের ধর্মে এবং সাহিত্যে—শুধু বাঙলাদেশের নহে, ভারতবর্ষের ধর্মে ও সাহিত্যে—আমরা রূপ ও তত্ত্ব মিশ্রিত রাধার যে মূর্তিখানি পাইতেছি তাহার ভিতরে প্রধানতঃ দুইটি উপাদান লক্ষ্য করিতে পারি; একটি হইল দার্শনিক তত্ত্বের দিক্ বা ধর্মতত্ত্বের (Theology) দিক্, অপরটি হইল কাব্যোপাখ্যানের দিক। রাধার ভিতরে এই উভয় দিক্‌ই একটি আশ্চর্য অবিনাবদ্ধ ভাব লাভ করিয়া আছে। (শশিভূষণ ১৩৯৬: ২)

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* ধর্মতত্ত্বের বিশুদ্ধতা রক্ষার চেয়ে কবিদের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল রাধা-কৃষ্ণের মানবিক প্রেম, তাঁদের মানবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ উপস্থাপনের দিকে। তবে এই দুই কবির অঙ্কিত রাধা চরিত্র সময়-সমাজভেদে এবং তাঁদের রূপকারদের সাহিত্যিক প্রবণতা ও পঠনপাঠনের অভিজ্ঞতাভেদে পরস্পর অনেকটাই স্বতন্ত্র। দুই কাব্যে রাধার বিরহ আলোচনার প্রেক্ষাপটও ভিন্ন।

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের প্রধান চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ ও দূতী বড়ায়ি। অন্যদিকে *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* দৃশ্যমান মনুষ্য চরিত্র একমাত্র রাধা। তাঁর সঙ্গে আলাদা মাত্রা হিসেবে যুক্ত হয়েছে প্রকৃতির বিবিধ অনুষঙ্গ। সখিকে উদ্দেশ্য করে রাধার উক্তি থাকলেও সেখানে সখির দিক থেকে কোনো প্রত্যুত্তর নেই। মধুকবিই যেন কাব্যে উপস্থিত হয়ে রাধার দুঃখে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে চেয়েছেন।

নারীকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে দুই কবি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ধারক। পুরাণ, লোকাচার বা লোকজ সংস্কৃতিও পৃথকভাবে দুই কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে। রাধার বিরহবেদনা ও শারীরিক বিচলন প্রকাশ করতে তাঁদের এইসব প্রকরণের ব্যবহার যথার্থ ও সফল—'মধুসূদনের রাধা ভক্ত

বৈষ্ণবের পরমাপ্রকৃতি রাধা নহেন; বিরহ-বিধুরা রমণী মাত্র। ... কবি একেবারে বিগলিতধারা রাধিকার বিষাদিনী-মূর্ত্তি পাঠকের সমক্ষে অবতারিত করিয়াছেন।' (যোগীন্দ্রনাথ ১৯৯৩: ২৯৩)

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* দ্বন্দ্বমুখর সংলাপ রাধার বিরহবেদনাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে—'পাত্র-পাত্রীর সম্পর্ক স্থাপন ও উক্তি-প্রত্যুক্তির মাধ্যমে মনের অবস্থা জানানোর এই রীতি (ধামালী গানের) *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* অনুসৃত হয়েছে। তবে এতে কবির কথা, পাত্রপাত্রীর আলাপচারিতার মধ্যে কবিকৃত ঘটনার বর্ণনাও আছে' (ওয়াকিল ১৯৯৪: ১২)। বড়ায়ি ও কৃষ্ণ কর্তৃক তাঁর উপর দোষারোপ, তাঁকে ধিক্কার যেন 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা' হিসেবে কাজ করেছে। এসব রাধাকে বিবেকের পীড়নে জর্জরিত করেছে, নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে প্রবৃত্ত করেছে:

> কৃষ্ণ রাধাকে গ্রহণ করিতে পুনঃপুনঃ অস্বীকার করিয়াছে, রাধার বিরহব্যাকুলতাকে দ্বিধাহীনভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছে; কিন্তু শত বেদনা ও আঘাত সত্ত্বেও রাধাকে কখনো কঠিন স্থূল অমার্জিত ভাষা প্রয়োগে নিযুক্ত হইতে দেখি না। ... রাধা এবং বড়াইয়ের কথোপকথনে দেখিতে পাই রাধা কৃষ্ণমিলনের জন্য অধীর। মিলনের এই ব্যাকুলতা অন্তরের অকৃত্রিম আকুলতা হইতেই সঞ্চারিত। (অমিত্রসূদন ২০১৬: ৩৯)

বড়ু চণ্ডীদাস পুরাণের ভিত্তির ওপরে লৌকিক কাহিনিকাব্য সৃষ্টি করেছেন, আর মধুসূদন আধুনিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানবিক রাধার দুঃখবোধ ও হতাশাকে চিত্রায়িত করেছেন। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে*ও ব্যাকুলতা আছে, তবে তা মৌন সখি ও প্রকৃতির প্রতি প্রকাশিত। উভয় কাব্যে বসন্ত-সমাগমে তাঁদের বিরহভাব অধিকতর তীব্র হয়েছে। *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* সম্পর্কে সমালোচকের মত স্মর্তব্য—'তিনি বৈষ্ণব কবিতার আধুনিক রূপ দিলেন। তাই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের শ্রীরাধা মর্ত্যমানবী; বঙ্গ ললনা, আধুনিকা নায়িকা, কোন অর্থেই সাধিকা নন, প্রেমিকা। যিনি সমাজ ও সংস্কার অপেক্ষা দেহধর্ম ও মনোধর্মকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।' (বিকাশ ২০২৪: ৬৭)

আরেকজন সমালোচক বলেন—'অসামাজিক প্রেমকে সামাজিক আকার দিয়েছেন মধুসূদন—এখানেও তিনি আধুনিক মানুষ। 'ব্রজাঙ্গনা'য় কৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নী রাধা, পত্নী এবং প্রেমিকার ছবি মিশে গিয়ে একাকার।' (সুদীপ ২০২৩: ১৩১) তবে মধুসূদনের অন্যান্য কাব্যের চেয়ে *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* স্বাতন্ত্র্য আছে:

> 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মধুসূদন দত্ত অল্প পরিসরের মধ্যে গ্রীক নিয়তিকে অবলম্বন করবার চেষ্টা করেছেন। অনেক সমালোচক বলে থাকেন যে এ কাব্যে পূর্বজন্মকৃত অপরাধের শাস্তি এবং কৃতকর্মের ফলভোগ আছে। বিভিন্ন চরিত্রের উক্তিতে এই পূর্বজন্মের কথা এবং কৃতকর্মের কথাই পাই; কিন্তু বিশেষভাবে অনুধাবন করলে দেখতে পাব যে এগুলো উক্তি স্বরূপেই আছে, মহাকাব্যের ঘটনা-সংস্থানে এগুলোর কোন পরিচয় নেই। (রফিকউল্লাহ-সৌরভ ২০১৯: ১৭৩)

*ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* নিয়তিবাদের এই দিক বা অভিসম্পাত কিছুই প্রায় নেই। বাঙালি মেয়ের সংস্কারে গড়ে ওঠা মধুসূদনের রাধা বাঙালি ঘরের মেয়ে। মধুসূদনের রাধার কণ্ঠে প্রতিহিংসার তীব্রতা ঝরে অক্রুরের প্রতি, যিনি কৃষ্ণকে বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়েছেন। বাঙালিত্ব পর্যবসিত *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধাতেও—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাধা যে ভাষায় কৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলিয়াছে তাহা যথার্থই বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের স্ত্রীলোকের ভাষা। রাধা যে বাংলার পল্লী অঞ্চলেরই এক কন্যা, তাহার বাগ্‌ভঙ্গিমার মধ্য দিয়া সে কথা সহজেই বোঝা যায়।' (অমিত্রসূদন ২০১৬: ৮২)

এখানে লক্ষণীয়, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা একেবারে প্রান্তিক খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি, তিনি সরাসরি কায়িক শ্রমে নিরত, ঘরকন্যার কাজেও তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়। রাধা সম্পূর্ণরূপে বাঙালি নারী:

> শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রাধা চন্দ্রাবলী আমাদেরই একজন। আমাদের মতো সমাজ-সংসারে প্রতিষ্ঠিতা, আমাদের মতো কামনা-বাসনা তাঁর আছে কিন্তু কুল হারাবার ভয়ও কম নেই। তাঁর ভয়, লজ্জা, ক্ষোভ, অসহায় অবস্থা তাঁকে অধিকতর মানবিকগুণে ভূষিত করেছে। (নীলিমা ১৯৯৬: ৪৫)

বাড়িতে শাশুড়ি-ননদ-স্বামীর দায়িত্ব পালন শেষে গোয়ালা পেশায় জীবিকার অন্বেষণও তাঁকে করতে হয়। পরিবারের সদস্যদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে তাঁকে কৃষ্ণ সন্নিধানে যেতে হয়, তার ভাবনায় ভাবিত হতে হয়। যদিও বিরহ দশায় তিনি অনেক ক্ষেত্রেই লোকলজ্জা ও কুলকলঙ্ককে অগ্রাহ্য করার অবস্থায় উপনীত হয়েছেন।

মধুসূদনের রাধা অনেকটাই মার্জিত ও সংস্কৃত, তাঁর ভাষাও বড়ুর রাধার মতো তত তীব্র-তীক্ষ্ণ নয়। বেদনাকে তিনি নিজের ভেতরেই যতটা সম্ভব বহন করতে চান। এই রাধা 'স্বামীর অপরাধের জন্য স্বামীকে অভিশাপ দেয় না, অভিশাপ দেয় সেই অগণিত নারীকে যারা রূপের বেসাতি দিয়ে তার হৃদয়নাথকে মোহাবিষ্ট করে।' (নীলিমা: ১১৯) আবার কখনো কৃষ্ণের প্রতি নারীদের আকর্ষণকে মেনেও নেন। মধুসূদনের পাশ্চাত্য সাহিত্যের পঠনপাঠন ও পাশ্চাত্য নায়িকাদের প্রভাব এখানে অগ্রাহ্য করা যায় না। প্রকৃতির অসামান্য রূপায়ণ ও প্রকৃতির প্রতি টান, দেশি ও সংস্কৃত শব্দ যুগপৎ ব্যবহার কাব্যটিকে অনন্যতা দিয়েছে। বৈষ্ণব কবিদের মতো তিনিও কবিতার শেষে ভণিতা ব্যবহার করেছেন। আঠারোটি কবিতায় ব্যাখ্যাত কাব্যটি নাট্যধর্মী নয়, অনেকটাই বিবরণধর্মী।

*মেঘনাদবধ কাব্যের* প্রায় সমসাময়িক কালে *ব্রজাঙ্গনা কাব্যটি* রচিত হয়, যদিও দুই কাব্য সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারাকে লালন করে। মধুসূদন বৈষ্ণব কবিতায় আকৃষ্ট ছিলেন, তারই প্রভাবে এই কাব্য রচিত। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রে তিনি উল্লেখ করেন—'I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ.' (গোলাম মুরশিদ ২০২৩: ১৬০)

সমালোচকের মতে:

> পদাবলীর সাধক কবিদের রচনা তাঁর হৃদয়কে প্রেম মাধুর্যে পূর্ণ করে দিলো। মধু স্বভাবতই স্নেহশীল, প্রেমিক ও আবেগ প্রধান চরিত্রের লোক ছিলেন, তাই প্রেমের কাব্য, রাধিকার প্রেমিকাহৃদয় তাঁকে একান্তভাবেই মুগ্ধ করেছিল। নানাভাবে ভারতীয় কাব্যের রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা-মাধুর্য, কবিওয়ালাদের সঙ্গীতধ্বনি, এবং ইটালীয় Ode-এর মাধুরিমা কবিচিত্তকে নব সৃষ্টি-প্রেরণা ও বেদনায় উন্মুখ করেছিল। (নীলিমা: ১১৩-১১৪)

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* ও *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* উভয়কাব্যে ভাব-সম্মিলন নয়, লৌকিক বিরহ দৃশ্যমান। বৈষ্ণব পদাবলির রাধার সঙ্গে এই দিক দিয়ে দুই কাব্যের রাধার অমিল। উনিশ শতকের

গীতিকবিতার ভাষায় মধুসূদন কাব্য রচনা করেছেন, আর বড়ু চণ্ডীদাস ব্যবহার করেছেন তাঁর সমকালের ভাষাভঙ্গি। তবে দুই রাধাই সমকালীন সাহিত্যিক ভাবধারা থেকে স্বতন্ত্রতর সৃষ্টি।

**তিন**

*ব্রজাঙ্গনা কাব্য* 'বিরহ' নামক প্রথম সর্গে বিন্যস্ত। তাতে ধারণা করা যায়, কবির নিশ্চয়ই কাব্যটির আরো সর্গ লেখার ইচ্ছা ছিল। কোনো কারণে তা আর সম্ভব হয়নি। মধ্যযুগের কাব্যের মতোই কবি অনেক কবিতার শেষে নিজের নামে ভণিতা ব্যবহার করেছেন। তবে তাঁর 'মধুসূদন' শব্দ ব্যবহার মধু নামক দৈত্যকে নাশকারী শ্রীকৃষ্ণকেই উদ্দেশ্য করে। সেদিক থেকে ইষ্টদেবতার ভজনা তথা মধ্যযুগের ধর্মভিত্তিক কাব্যের প্রচলিত রীতির অনুসরণ হিসেবেও একে ধরা যেতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাসের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা তাঁর সমকালীন রীতির অনুসারী।

'বংশী-ধ্বনি', 'জলধর', 'যমুনাতটে', 'ময়ূরী', 'পৃথিবী', 'প্রতিধ্বনি', 'ঊষা', 'কুসুম', 'মলয় মারুত', 'বংশীধ্বনি', 'গোধূলি', 'গোবর্দ্ধন গিরি', 'সারিকা', 'কৃষ্ণচূড়া', 'নিকুঞ্জবনে', 'সখী', 'বসন্তে', 'বসন্তে'—এই আঠারোটি শিরোনামে এবং প্রতি অংশে কয়েকটি করে কবিতায় *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* বিন্যস্ত হয়েছে। অন্যদিকে 'অথঃরাধাবিরহ' অংশটি *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের তেরোটি খণ্ডের মধ্যে একটি অংশ।

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* 'বংশী খণ্ড' নামের অধ্যায়ে কৃষ্ণের বাঁশি শুনে রাধার উতলা হওয়া এবং কৃষ্ণের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া বিষয়ক ঘটনাধারা বর্ণিত আছে। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* শুধু রাধার বিরহাবস্থা রূপায়িত, কিন্তু সেখানে প্রকারান্তরে 'বংশী খণ্ডে'র ঘটনার প্রতিফলন লক্ষযোগ্য। কৃষ্ণ রাধাকে ত্যাগ করে মথুরা গমন করলেও রাধা যেন তাকে প্রত্যক্ষ করেন। তিনি যেন বৃন্দাবনের কদম্বতলে কৃষ্ণকে বাঁশি বাজিয়ে নৃত্য করতে দেখেন। নিম্নোক্ত বর্ণনা রাধার বিহ্বল মনের আবেগজাত ভ্রমাত্মক অবস্থার প্রকাশক:

নাচিছে কদম্বমূলে,
বাজায়ে মুরলী, রে,
রাধিকারমণ!
চল, সখি, ত্বরা করি,
দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন! ('বংশী-ধ্বনি-১', মধুসূদন ২০০৯: ১১৯)

রাধা যে কৃষ্ণের প্রেমে পূর্ণ-সমর্পিতা, তার উদাহরণ কৃষ্ণের চরণকে ভেবেই তিনি যেন প্রেমরস আস্বাদন করতে পারছেন। অর্থাৎ, এখানে বিরহে তার প্রেমভাবনা আরো গাঢ়তর হয়েছে:

কে ও বাজাইছে বাঁশী, স্বজনি,
মৃদু মৃদু স্বরে নিকুঞ্জবনে?
নিবার উহারে; শুনি ও ধ্বনি
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে লো মনে? ('বংশীধ্বনি-১', মধুসূদন ২০০৯: ১২৬)

রাধা জানেন স্মৃতি জ্বালাময়ী, তবু মনকে প্রবোধ দিতে পারেন না। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যের* রাধার আত্মহত্যার প্রবৃত্তি নেই, তবে আশঙ্কা করেন তিনি বিরহে মারা যান কি না। তার সন্দেহ হয়, এ জীবনে হয়তো আর কৃষ্ণকে পাবেন না:

> হায় লো সখি, কি হবে স্মরিলে
> গত সুখ? তারে পাব কি আর? ('বংশীধ্বনি-৫', মধুসূদন ২০০৯: ১২৬)

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা স্বপ্নে-জাগরণে কৃষ্ণকেই দেখেন। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* স্বপ্নের উল্লেখ নেই। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাধা বিরহে উতলা ও উন্মাদপ্রায়। বড়ায়িকে রাধা দুঃখের কথা এভাবে জানাচ্ছেন—'মাথা মুণ্ডিআঁ যোগিনী হআঁ বেড়ায়িবোঁ নানা দেশে' (৩৬৭/৪, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪১৮)। বারবার মৃত্যুচেতনা উঠে এসেছে রাধার উক্তিতে:

> যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে। হাতে তুলিআঁ মো খাইবোঁ গরলে॥ (৩৫৪/২, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪০৮)

কিংবা,

> এহি ত বৃন্দাবন বড়ায়ি পুড়িআঁ মারে মণে পড়ে কাহ্নাঞিঁর নেহে।
>
> এবেঁ থীর নহে ... এ বড়ায়ি কোণ পরকারে মরি জাইব কাহ্নের বিরহে॥ (৩৬৯/৩, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪১৯)

মধ্যযুগের কাব্যধারার অন্যতম অনুষঙ্গ ছিল কামচেতনা বা দেহবাদী শরীরী চেতনা। সেই সূত্র ধরে মধুসূদনও তাঁর কাব্যে রাধা-কৃষ্ণের শরীরী অনুষঙ্গকে এনেছেন, তবে তা অনেকটা উনিশ শতকের মানবিক সংবেদনায় পরিমার্জিত। ব্রজাঙ্গনা শরীরী ব্যাকুলতা থেকে মুক্ত অনেকাংশে:

> যে যাহারে ভাল বাসে,
> সে যাইবে তার পাশে—
> মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে?
> যদি অবহেলা করি,
> রুষিবে শম্বর-অরি;
> কে সম্বরে স্মর-শরে এ তিন ভুবনে! ('বংশী-ধ্বনি-২', মধুসূদন ২০০৯: ১১৯)

অর্থাৎ, নিজেদের শরীরী প্রেমকে রাধা এখানে অনেকটা বিধির বিধান হিসেবে মেনে নিয়েছেন বা কামদেবতার লীলা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। প্রেমে দেহচেতনা সম্পর্কে রাধা সচেতন, কিন্তু কেবল শরীরীভাবেই তিনি ভাবিত নন। পক্ষান্তরে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা শরীরী প্রেমে জর্জরিত, কৃষ্ণের বিরহে সেই বেদনা হয়েছে বহুগুণ। এই কামচেতনা আদি-মধ্যযুগের কাব্যের এক অনিবার্য বৈশিষ্ট্য:

> ঊন্নত যৌবন মোর দিনে দিনে শেষ। কাহ্নাঞিঁ না বুঝে দৈবেঁ এ বিশেষ॥ (৩৬৮/৩, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪১৮)

কিংবা,

> আজি সপন বড়ায়ি দেখিল এ আল আলিছিল নান্দের নন্দন।

বাহুলতাপাশেঁ বান্ধিআঁ এ দিলোঁ মোঞ দৃঢ় আলিঙ্গন॥ (৩৭১/১, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪২০)

স্বপ্নেও সেই দেহবাদী প্রেমচেতনাই মুখ্য হয়ে ওঠে। এমনকি চিরন্তন নর-নারীর শরীরী অদম্য আকর্ষণকে কবি তুলে ধরেছেন রাধার জবানিতে। যৌবনে পুরুষ বিনা নারীর রাত্রিকালীন জীবন যেন বিফল:

নিশি আন্ধিআরী তাহাত কেমনে নারী।
জিএ সে জাহার পাসত পুরুষ নাহী॥ (৩৯২/১, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪৩৩)

রাধার এও সন্দেহ যে, কৃষ্ণ নিশ্চয়ই অন্য নারীতে মজে আছে:

সে কাহ্নাঞিঁ দিআঁ মোক দুখ আতী। রতি ভুঞ্জে লআঁ কোণ যুবতী॥ (৩৭০/৩, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪২০)

এই চিন্তা তার দহনকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা চরিত্র প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন:

তার কিশোরী মনের নীতিগত সংস্কার ও লোকলজ্জা পেরিয়ে পরপুরুষের সঙ্গে রতির মানস বিবর্তনটি কবি বেশ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মুখরা তর্কনিপুণা কিশোরী রতি বিষয়ে এবং পরকীয়া রতিতে সাংসারিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়া বিষয়ে প্রথম থেকেই যথেষ্ট অভিজ্ঞার মত ব্যবহার করেছেন, তবে কৃষ্ণের আহ্বানে সাড়া দেবার মতো মনের প্রস্তুতি ঘটতে কয়েকটি ঘটনাগত স্তর উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজন ছিল। কবি বিশেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে সেই স্তরগুলি দেখিয়েছেন। (নীলরতন ২০০৪: ৭৩)

তবে রাধা এ কাব্যে দেহগত স্তর পেরিয়ে ক্রমশ হৃদয়জ নৈকট্য অনুভব করেছেন কৃষ্ণের প্রতি। ফলে তার বিরহবেদনা ক্রমশ বিকারের দিকে ধাবিত হয়েছে।

*ব্রজাঙ্গনার* রাধা জানেন কৃষ্ণ সবার ভালোবাসারই যোগ্য, রাধা এই ধ্রুব সত্যকে মানেন। তাতে তার দুঃখ নেই। কিন্তু এই বিরহ তিনি সহ্য করতে পারছেন না:

আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি? ('ময়ূরী-১', মধুসূদন ২০০৯: ১২২)

প্রেমের অংশীদারিত্বেও অসুবিধা নেই যেন তার। নিজের শোককে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা তার, তবু যেন কৃষ্ণের দেখা পাওয়া যায়। এই কারণেই নিজের সংসার ও কুলমর্যাদা তুচ্ছ করে তিনি কৃষ্ণের প্রেমে সমর্পিতা হয়েছেন। তবে তার জন্য কোনো খেদ নেই তার:

মম শ্যাম-রূপ অনুপম ত্রিভুবনে!
হায় ও রূপ-মাধুরী, কার মন নাহি চুরি
করে, রে শিখিনি!
যার আঁখি দেখিয়াছে রাধিকামোহনে,
সেই জানে কেনে রাধা কুলকলঙ্কিনী! ('ময়ূরী-৪', মধুসূদন ২০০৯: ১২২)

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধারও কৃষ্ণপ্রেমে মোহিতা হয়ে লাঞ্ছনার শেষ নেই—'মানুষের সমাজবন্ধনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বাসকারী মানুষের উপর আরোপিত হয়েছে নানা অনুশাসন। মূলত এই অনুশাসন স্মৃতিশাস্ত্রকেন্দ্রিক' (তপেন্দ্র ২০২৩: ১১৪)। রাধাও তাঁর কুলকলঙ্ক বিষয়ে সচেতন কিন্তু তাঁর অন্য উপায় নেই, তিনি অনন্যোপায়:

> সামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
> সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে॥
> এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহাত লাগী বড়ায়ি মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
> (৩৬২/৩-৪, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪১৫)

তার প্রায়শই আফসোস হয় এবং তিনি নিজেকে ধিক্কার দেন, কেন আগে কৃষ্ণকে পদে পদে হেনস্থা করেছেন, তাকে চাহিদা অনুযায়ী শরীরী সাহচর্য দেননি। কৃষ্ণের নিকট বারংবার সেজন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করেও রাধা পার পাননি। কৃষ্ণ রাধাকে শরীরী আলিঙ্গন তো দিতে চানই না, উলটা তাকে গালাগালিতে প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং তাকে ত্যাগ করে চলেই গেছেন। বিবেকের পীড়ন এবং সেই সঙ্গে শরীরী আশ্লেষে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা যেন মৃতপ্রায়:

> তেজিলো সুখ আসেস দিনে দিনে তনু শেষ
> ভাবিএঁা সে কাহ্নের নেহে॥
> বিধি বিপরীত ভৈল আহ্মা ছাড়ি কাহ্ন গেল
> বিরহে মা জিবোঁ কত দিশে। (৪১০/৩-৪, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪৪৬)

যদিও কাব্যের শেষে বড়ায়ির অনুরোধে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে শরীরী সাহচর্য দিতে সম্মত হয়েছেন এবং তার পরপরই চিরতরে তাকে ত্যাগ করে চলে গেছেন।

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা ভাগ্যকে মানেন, তবু সর্বোচ্চ চেষ্টা করে যান কৃষ্ণকে পাওয়ার জন্য। প্রবাদ ব্যবহার করে রাধার দুরবস্থা দেখিয়েছেন কবি, এখানে রাধা যেন দুর্দশাগ্রস্ত:

> যে ডালে করো মো ভরে সে ডাল ভাঙ্গিএঁা পড়ে। (৩৯২/৩, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪৩৩)

বড়ায়িকে শপথ করে রাধা অনুরোধ করেন কৃষ্ণের সন্ধানে যেতে। আবার নারদ সর্বত্রগামী বলে নারদকেও অনুরোধ করেন কৃষ্ণের অনুসন্ধান করতে:

> করিআঁ প্রণাম নারদ চরণে রাধা পুছে যোড় হাথে।
> নিদয় হৃদয় নান্দের নন্দন কথাঁ বসে জগন্নাথে॥
> কি মোর জীবন যৌবন নারদ কি মোর এ ধন বাসে।
> কাহ্ন বিনি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ ভ্রমিবোঁ সকল দেশে॥ (৩৯৬/৫, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪৩৬)

নারদের কাছেই রাধা খবর পান, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে কদম্বতলে পুষ্পশয্যায় শায়িত আছেন; এবং কৃষ্ণ সন্নিধানে গিয়ে—'কৃষ্ণের বদন দূরে দেখি রাধা মুরুছা পাইল তখনে' (৩৯৬/৯, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪৩৬)। এই মূর্ছা যাওয়া রাধার বিরহের প্রকটতা ও তৎসৃষ্ট দৈহিক বিকলতাকে নির্দেশ করে।

প্রকৃতি বিরাট চরিত্র হয়ে, কোথাও রাধার কাছে দূত এবং বিরহবেদনা প্রকাশের আধার হিসেবে উপস্থিত হয়েছে মধুসূদনের *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে*। প্রকৃতির বিভিন্ন পরিবর্তন রাধাকে বারংবার উতলা

করে তুলে প্রিয় সন্নিধানে যেতে প্ররোচিত করেছে। ফলে রাধার বিরহবেদনা বহুলাংশে বর্ধিত হয়েছে তার মধ্যে এক বিবসা-বিস্রস্ত অবস্থার সৃষ্টি করেছে। প্রায়শই কবি মধুসূদন কাব্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে রাধাকে যেন স্তোকবাক্যে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এ এক নতুনতর কাব্যভাবনা কবির। এখানেও কবি শ্লীলতার আবরণে রাধা-কৃষ্ণের দেহবাদী প্রেমকে ফুটিয়ে তুলেছেন, যা প্রকারান্তরে একান্তই নর-নারীর মানবিক প্রেমের কামনার বহিঃপ্রকাশ:

মধু কহে ব্রজাঙ্গনে,
স্মরি ও রাঙা চরণে,
যাও যথা ডাকে তোমা শ্রীমধুসূদন!
যৌবন মধুর কাল,
আশু বিনাশিবে কাল,
কালে পিও প্রেমমধু করিয়া যতন। ('বংশী-ধ্বনি-৬', মধুসূদন ২০০৯: ১২০)

মধুসূদন এখানে কালিদাসের *মেঘদূত* কাব্যের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। তাই জলধর তথা মেঘকে উদ্দেশ্য করেও তাঁর রাধা বিরদবেদনাকে প্রকাশ করেছেন। সাগর-বিরহে নদীর বেদনাকে ধারণ করেছেন:

সাগর-বিরহে যদি, প্রাণ তব কাঁদে, নদি
তোমার মনের কথা কহ রাধিকারে—
তুমি কি জান না, ধনি, সেও বিরহিণী? ('যমুনাতটে-১', মধুসূদন ২০০৯: ১২১)

রাধা সব ভূষণ-অলংকার ত্যাগ করেছেন, সর্বত্র যেন বিরাগ আর বৈরাগ্যের সুর। তবে *ব্রজাঙ্গনা কাব্যের* রাধা নিজের সধবা অবস্থা সম্পর্কেও সচেতন! এখানে বাঙালি নারীর সংস্কারচেতনা ক্রিয়াশীল:

তবে যে সিন্দূরবিন্দু দেখিছ ললাটে,
সধবা বলিয়া আমি রেখেছি ইহারে!
কিন্তু অগ্নিশিখা সম, হে সখি, সীমন্তে মম
জ্বালিছে এ রেখা আজি—কহিনু তোমারে ('যমুনাতটে-৫', মধুসূদন ২০০৯: ১২১)

পক্ষান্তরে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাধা উন্মাদিনীপ্রায়, সিঁদুর মুছে ফেলতে উদ্যত। বড়ায়ির কাছে তার সেই মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে:

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবঈ আসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ য়ে সিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শংখচুর॥ (৩৫৪/১, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪০৮)

তবে বড়ু চণ্ডীদাসের রাধাও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় একান্তই সংস্কারবতী। বিহ্বল হলেও ভালো-মন্দ তিনি একেবারে বিস্মৃত নন। এটা তাঁর গার্হস্থ্যচেতনার অসামান্য নিদর্শন। তাই কৃষ্ণ-অন্বেষণে যাওয়ার আগে বড়ায়িকে তিনি শুভক্ষণ দেখে যাওয়ার অনুরোধ করেন, তবেই যেন তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হতে পারে:

তোহ্মে যাত্রা কর শুভক্ষণে।

বড়ায়ি ঝাঁট চল কাহ্নাঞিঁর থানে।
বিনয়বচনে তোষিআঁ কাহ্নাঞিঁ আন মোর থানে॥ (৩৯৪/১, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪৩৪)

পুরাণচেতনার প্রতিফলন হিসেবে *রামায়ণ* কাহিনির উল্লেখ আছে উভয় কাব্যেই। বিরহবিধুরা রাধা পাতালে প্রবেশ করে যেন অসীম যাতনা থেকে মুক্তি চান। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* তিনি বলছেন:

তুমি, ধনি, দ্বিধা হয়ে, বৈদেহীরে কোলে লয়ে,
জুড়ালে তাহার জ্বালা বাসুকি-রমণি! ('পৃথিবী-১', মধুসূদন ২০০৯: ১২২)

একই প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়েছে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* বিরহাতুর রাধার মধ্যেও:

চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদিনী বিদার দেঊ পসিআঁ লুকাওঁ॥ (৩৬৮/১, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪১৮)

*ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* রাধার শরীরী প্রেমকে দেখাতে কবি কামদেবতা ও তাঁর পত্নীর সম্পর্কের প্রসঙ্গ এনেছেন। তবে সে উচ্চারণ অনেকাংশে শ্লীলতার আবরণে আবৃত। রতি-মদনের কথা বারংবার এসেছে, বিশেষত কামদেবতা মদনের কথা—'সেবে তোমা, রতি যথা সেবেন মদন' ('মলয় মারুত-১', মধুসূদন ২০০৯: ১২৫), প্রকারান্তরে তা নারী কর্তৃক পুরুষকে সেবাদানের প্রবৃত্তির দৃষ্টান্ত। কালিদাস *মেঘদূতে* মেঘকে বারতা পাঠাতে অনুরোধ করেছেন। এখানে মধুসূদন বায়ুকে দূত নিয়োগ করতে চান। নব নব প্রলোভন এড়িয়ে যেন বায়ু দ্রুত বার্তা নিয়ে যায়:

তবে যদি, সুভগ, এ অভাগীর দুঃখে
দুঃখী তুমি মনে,
যাও আশু, আশুগতি, যথা ব্রজকুলপতি—
যাও যথা পাবে, দেব, ব্রজের রতনে!
রাধার রোদনধ্বনি বহ যথা শ্যামমণি—
কহ তাঁরে মরে রাধা শ্যামের বিহনে! ('মলয় মারুত-৪', মধুসূদন ২০০৯: ১২৫)

'গোধূলি' অংশের ৬ ও ৭ সংখ্যক কবিতায়ও বাতাসকে রাধা আহ্বান করছেন দূত হতে। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* রাধা-ভিন্ন অন্য কোনো মানুষের উপস্থিতি দেখা যায় না। রাধা কৃষ্ণ-বিরহে বিকারগ্রস্তপ্রায়। তাই একপর্যায়ে কুলমানভয়কে তিনি অগ্রাহ্য করেছেন—'আমি কেন না কাটিব শরমের ফাঁসি?' (বংশী-ধ্বনি-৩, মধুসূদন ২০০৯: ১১৯)। 'গোবর্দ্ধন গিরি' অংশে শৈলরাজকে খুশি করার জন্য রাধা তার মহিমা কীর্তন করেছেন এবং তাকে উদ্দেশ্য করে বলছেন:

কেনে যে এসেছি আমি তোমার সদনে—
শরমে মরমকথা কহিব কেমনে,
আমি দেব কুলের কামিনী! ('গোবর্দ্ধন গিরি-১', মধুসূদন ২০০৯: ১২৭)

তারপর তিনি যেন বিরহকে সহ্য করে স্থির থাকতে পারেন, সেই কৌশল শেখাতে অনুরোধ করেছেন ধীর-স্থির মহীকে:

হে ধীর! শরমহীন ভেবো না রাধারে—
অসহ যাতনা দেব, সহিব কেমনে?
ডুবি আমি কুলবালা অকুল পাথারে

কি করি নীরবে রবো শিখাও আমারে—
এ মিনতি তোমার চরণে। ('গোবর্দ্ধন গিরি-৬', মধুসূদন ২০০৯: ১২৮)

এমনকি কুলের মুখে কলঙ্কের কালি লাগলেও সব ছেড়ে কৃষ্ণের খোঁজে বেরিয়ে যেতে চেয়েছেন। এ পর্যায়ে রাধা উন্মাদপ্রায়। বসুধা নিজের চুলে কৃষ্ণচূড়া পরেছিল, তাই:

রাগে তারে গালি দিয়া, লয়েছি আমি কাড়িয়া—
মোর কৃষ্ণ-চূড়া কেনে পরিবে ধরণী? ('কৃষ্ণচূড়া-১', মধুসূদন ২০০৯: ১২৯)

অসীম বিরহে রাধা শেষে যেন মৃতপ্রায় হয়েছেন। ব্রজাঙ্গনার রাধার সন্দেহ হয় কৃষ্ণের বিরূপতা সম্পর্কে যে, তিনি মথুরায় গিয়ে নিজের মন ফিরিয়ে নিয়েছেন কি না। তবে সেজন্য কাউকে তার কোনো দোষারোপ নেই:

যে ধন রাধায় দিয়া, রাধার মনঃ কিনিয়া
লয়েছিলা হরি,
সে ধন কি শ্যামরায়, কেড়ে নিলা পুনরায়?
মধু কহে, তাও কভু হয় কি, সুন্দরি? ('কৃষ্ণচূড়া-৪', মধুসূদন ২০০৯: ১২৯)

বনকে সাক্ষী মেনে বিরহে আশু মৃত্যুচিন্তা করেন রাধা। কৃষ্ণকে ভুলতে পারেন না, ভুলতে চানও না। বনকে উদ্দেশ্য করে রাধার শরীরীচেতনা ও বিরহবেদনাকে একীভূত করেন কবি:

কাম-বঁধু যথা মধু
তুমি হে শ্যামের বঁধু
একাকী আজি গো তুমি কিসের কারণ,
হে বসন্ত, কোথা আজি তোমার মদন?
তবে পদে বিলাপিনী
কাঁদি আমি অভাগিনী,
কোথা মম শ্যামমণি—কহ কুঞ্জবর! ('নিকুঞ্জবনে-৫', মধুসূদন ২০০৯: ১৩০)

*ব্রজাঙ্গনার* রাধা সখীকে উদ্দেশ্য করে একেবারেই বাঙালি চিরন্তন মেয়েদের ভাষা তথা মেয়েলি কথ্য ভাষায় কথা বলেন। একাধিকবার ধ্রুবপদের মতো ব্যবহার করা হয়েছে সেই আহ্বান:

হ্যাদে, তোর পায় ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ? ('সখী-১', মধুসূদন ২০০৯: ১৩০)

আবার দুঃখ ভুলে, অশ্রু মুছে স্থির বিশ্বাস রাখেন—'আইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব!' ('বসন্তে-১', মধুসূদন ২০০৯: ১৩১) বিরহে আপ্লুতা ব্রজাঙ্গনার রাধাও বিকলপ্রায়। এ পর্যায়ে রাধার শরীরী অনুরাগ প্রকাশিত এভাবে:

সখি রে,—
এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে!
ভালে যে সিন্দূরবিন্দু, হইবে চন্দনবিন্দু;—
দেখিব লো দশ ইন্দু
সুনখগণে!
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে! ('বসন্তে-৬', মধুসূদন ২০০৯: ১৩২)

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা কৃষ্ণের বিরূপতার জন্য নিজের দায় যেমন মানেন, তেমনই বড়ায়ির দুর্ব্যবহারকেও দায়ী করেন। তার বিশ্বাস, বড়ায়ি নিন্দাবাচক নানা কথা বলে রাধার প্রতি কৃষ্ণকে বিমুখ করেছে। এই ভাবনা রাধাকে ক্রোধোন্মত্ত করে, আবার বড়ায়ির সাহায্য ব্যতীত রাধা নিরুপায়:

> তোর যুগতীঞ বুঢ়ী আহ্মাক নিন্দতে ছাড়ী মথুরাক গেলা প্রাণেশ্বরে।
> চরণে ধরোঁ তোহ্মার কাহ্ন দেহ একবার নহে বধ দিবোঁ মো তোহ্মারে॥ (৪১৫/৭, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪৪৯)

সমালোচকের মতে, *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* 'কাব্যের শুরুতে রাধা সমাজভয়ে ভীতা, কাব্যের শেষ দিকে সমাজভয় তিনি উপেক্ষা করেছেন। প্রবল বিরহবোধ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে' (উপল ২০০৯: ১০৯)। ফলে পারিবারিক সব সংকট ও ভয় ছেড়ে তিনি কৃষ্ণ-সকাশে বেরিয়ে পড়তে চান। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যের* রাধাও এক পর্যায়ে কলঙ্কভয়হীনা হয়ে কৃষ্ণ সন্নিধানে যাওয়ার ইচ্ছাপোষণ করেছেন। প্রেমের বিরহজনিত বেদনাভার এখানে জাগতিক সবকিছুকে যেন তুচ্ছ করে দিয়েছে:

> দেহ ছাড়ি, যাই চলি যথা বনমালী;
> লাগুক্ কুলের মুখে কলঙ্কের কালি! ('সারিকা-৫', মধুসূদন ২০০৯: ১২৯)

**চার**

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যে এবং *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* রাধার চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই লক্ষণীয়। উভয় কবি ধর্মের নিবেদন ও ভক্তিকে দূরে রেখে নিতান্তই মানব-মানবীর প্রেমকে রূপায়িত করেছেন। বিশেষত রাধা চরিত্র সম্পূর্ণতই সাধারণ আটপৌরে বাঙালি রমণী, যে প্রিয়বিরহে ব্যাকুল। তার এই ব্যাকুলতা আরো বাধাহীন ও উন্মাদপ্রায় কারণ, প্রথমে তিনি এই সম্পর্কে নিস্পৃহ থাকলেও কৃষ্ণ তাঁকে বিভিন্নভাবে প্ররোচিত ও নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে রাধাকে এই সম্পর্কে নীত হতে বাধ্য করেছেন। আর যখনই রাধা কৃষ্ণপ্রাণা হয়ে সম্পর্কে একনিষ্ঠ হয়েছেন, তখনই কৃষ্ণ রাধাকে চিরতরে ছেড়ে মথুরাতে চলে গিয়েছেন। উভয় কবিই এই মূল সুরটি ঠিক রেখে রাধার উপর এই ঘটনার প্রভাবকে রূপায়িত করেছেন। রাধার বিরহদশাকে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোকিল, নদীর কলকলধ্বনি, প্রকৃতির বসন্ত সমাগম এবং পুরাণকে যুগপৎ ব্যবহার করেছেন তাঁরা। বসন্তের সমাগমে প্রকৃতি ও প্রাণীজগতে যে কল্লোল জাগে, নবরূপে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, তা রাধার বিরহবেদনাকে বাড়িয়ে তুলছে। পূর্বস্মৃতি ও বসন্তে কৃষ্ণের সঙ্গে বিহারের কথা স্মরণ করে তার অন্তর আরো রক্তাক্ত হয়েছে।

মধুসূদন তাঁর কাব্যকে এগিয়ে নিয়েছেন মূলত পুরাণচেতনা ও দেশজ সংস্কারের সমন্বয়ে। মধুসূদনের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পুরাণচেতনা ও সাহিত্যচেতনা এবং অসাধারণ সমন্বয় করার গুণ এক্ষেত্রে কাব্যটিকে নতুন মাত্রায় উন্নীত করেছে। উল্লেখ্য, *মেঘনাদবধ কাব্য* ও *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* একই সালে প্রকাশিত। অর্থাৎ, কবি দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন রস ও ভাবধারার কাব্যকে একই সময়ে

সৃষ্টি করেছেন। মহৎ প্রতিভা ব্যতীত এমনতর রূপায়ণ সম্ভব নয়। অন্যদিকে, বড়ু চণ্ডীদাস প্রধানত লোকাচার ও লৌকিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই প্রেমকাহিনিকে বিন্যস্ত করেছেন। ফলে তাঁর রাধা সম্পূর্ণভাবেই মানবিক এবং বাঙালির ঘরের নারীর প্রতিচ্ছবি। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাধা কৃষ্ণের বিরূপ হয়ে তাঁকে ত্যাগ করে যাওয়াকে পূর্বজন্মের কর্মফল মনে করেন:

> কিবা পুরুব জরমে খণ্ডব্রত কইল আহ্মে।
> তার ফলেঁ কাহ্নাঞিঁ হারায়িলোঁ॥ (৩৫০/১৩, বড়ু চণ্ডীদাস ২০১৬: ৪০৬)

অন্যদিকে, *ব্রজাঙ্গনা কাব্যের* রাধা কৃষ্ণের প্রস্থানের পেছনে পুরাণকাহিনি অনুসারে কৃষ্ণের দায়িত্ববোধকেই মেনেছেন। তার এই ভাবনা মধুসূদনের আধুনিক মনোভঙ্গির নিদর্শন। অক্রুরের আহ্বানে কংসকে বধ করার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ বৃন্দাবন ছেড়ে মথুরা গমন করেন:

> হায় রে যমুনে, কেনে না ডুবিল
> তোমার জলে
> অদয় অক্রুর, যবে সে আইল
> ব্রজমণ্ডলে?
> ক্রুর দূত হেন, বধিলে না কেন
> বলে কি ছলে? ('কুসুম-৫', মধুসূদন ২০০৯: ১২৫)

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন* কাব্যের রাধা চরিত্রে আক্ষেপ প্রচুর, তবে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা আছে তাঁর, কাতর অনুনয় আছে বিভিন্ন জনকে। এই রাধার ক্রিয়াশীলতা বেশি। উভয় কাব্যের রাধাই প্রকৃতির নানা অনুষঙ্গের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে তুলনা করেছেন। উভয় স্থানেই পাখির সঙ্গে নিজের তুলনা করেছেন—উড়ে উড়ে স্বাধীনমতো কৃষ্ণের কাছে যেতে পারছেন না!

*ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* রাধার নিজের কৃতকর্মের প্রতি পীড়ন নেই। প্রকৃতির কাছে গিয়ে অনুরোধ আছে। এই রাধা তুলনামূলক কোমল। *ব্রজাঙ্গনা কাব্যের* রাধার একমুখী দুঃখ প্রকাশের বিপরীতে অন্যদের খোঁচা বা অপবাদ দেওয়া *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* রাধাকে অধিকতর ব্যতিব্যস্ত ও মর্মাহত করেছে। এই কারণে রাধার বহুবার নিজের মৃত্যুকামনা এমনকি আত্মহত্যার সংকল্পও অত্যন্ত স্বাভাবিক। রাধা এখানে বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন কৃষ্ণের দ্বারা, বড়ায়ির দ্বারা বিব্রত হয়েছেন। কৃষ্ণের নিকট বারংবার নিজের দোষ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা করেও তাঁর শান্তি আসেনি।

*শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে* নাট্যগুণ ও প্রচুর ঘাত-প্রতিঘাতের বিপরীতে *ব্রজাঙ্গনা কাব্যে* গীতিকাব্যে রোমান্টিক তন্ময়তা ব্যক্ত হয়েছে। যথাক্রমে তীব্র-তীক্ষ্ণতা, শরীরী আশ্লেষ বনাম অপেক্ষাকৃত কোমলতা বা অন্তর্গত দুঃখবোধ, শালীন কামনা দুই কাব্যের রাধাকে পরস্পর স্বতন্ত্র করেছে।

বড়ু চণ্ডীদাস একাধিকবার দেবী চণ্ডীকে পূজা দেওয়ার জন্য বা দেবী চণ্ডীর কাছে মানত করার জন্য রাধাকে পরামর্শ দিয়েছেন, তাহলে কৃষ্ণকে পাওয়া যাবে। মধুসূদন এমন কোনো পথ দেখাননি, তিনি বরং ভণিতায় রাধাকে সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়ে কৃষ্ণকে লাভের ব্যাপারে তাঁকে আশাবাদী রেখেছেন।

**পাঁচ**

বড়ু চণ্ডীদাস ও মধুসূদন দত্ত—দুজনের কেউই রাধা-কৃষ্ণের দেবত্বের প্রতি ভক্তিগাথা রচনা করেননি। বরং বহুল প্রচলিত প্রেমকাহিনিকে কেন্দ্র করে সাহিত্যরস অন্বেষণ ও সঞ্চার করেছেন। ফলে কাব্যদ্বয়ের গঠন ও অন্তর্গত বক্তব্য অত্যন্ত মানবীয়। মধ্যযুগের নারীদের তুলনায় *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা ব্যতিক্রম। এই রাধা আত্মনির্ভরশীল। যদিও মধ্যযুগে নারী ছিল পরনির্ভরশীল—'বাঙালী রমণীকুলের এরূপ পরনির্ভরশীল জীবন-যাত্রার অন্যতম কারণ ছিল পিতা ও পতির সম্পত্তিতে হিন্দু নারীর অনধিকার। ... হিন্দুসমাজ নারীকে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল হওয়া যুক্তি-যুক্ত মনে করতো' (মুহম্মদ আবদুল ১৯৮৬: ১৪৯)। কিন্তু এই রাধা ব্যতিক্রম। গোয়ালাদের জীবিকায় ও বৃত্তিতে নারীর সক্রিয়তা ও নারীর ওপর নির্ভরশীলতা এখানে প্রভাবক হয়ে থাকতে পারে। ফলে *শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের* রাধা অনেকটাই স্বাধীন। এই রাধা অত্যন্ত সাহসী, তবে কৃষ্ণপ্রেমে সমর্পিতা হয়ে পূর্ণ নিবেদিতা। বড়ু চণ্ডীদাস সমকালের তুলনায় এখানে মানবিকতায় প্রাগ্রসর। মধুসূদন পৌরাণিক রাধা চরিত্রকে নবরূপ দিয়েছেন, মার্জিত-সংস্কৃত মননের অধিকারীরূপে। তার বেদনাকে লৌকিক জীবন-ভঙ্গিমায় লীন করে একান্তই মানবিক করে দেখিয়েছেন। পূর্ববর্তী বাংলা কাব্যের আদিরসাত্মক ভাষাভঙ্গিমায় তিনি আরোপ করেছেন শ্লীল-মার্জিত ভাষা। সেখানে অন্যের প্রতি বিশেষ রাগ বা দ্বেষ নেই, ছল-কটূক্তিও নেই প্রায়। আছে নিজের যন্ত্রণা থেকে উত্তরণের একান্ত চেষ্টা। সমালোচকের মতে:

> [মধুসূদন] ভারতের ক্লাসিক সাহিত্য, পুরাণ ও *রামায়ণ মহাভারতের* বিষয়বস্তু অবলম্বনেই বাংলাকাব্যের আসরে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাঁর কবিজীবনের সূচনা যেমন বিদেশী ভাষার মাধ্যমে, বাংলাকাব্য সৃষ্টির প্রাথমিক প্রেরণা ও পরিকল্পনাও তাঁর তেমনি পাশ্চাত্ত্য শিল্প-সাহিত্য-সম্ভূত। দেশী ও সনাতন বিষয়বস্তুর বিদেশী ও অধুনাতন শিল্পরূপ দানই ছিল হিন্দু কলেজের শিক্ষাপ্রাপ্ত মধুসূদনের প্রথম সংকল্প। (রফিকউল্লাহ-সৌরভ ২০১৯: ২২১)

এই বক্তব্য *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* সম্পর্কেও যথার্থ। তাই তাঁর সৃষ্ট *ব্রজাঙ্গনা কাব্য* পূর্বের বৈষ্ণব পদাবলির ভাব থেকে পৃথক। তাঁর রাধা স্পষ্টতই পূর্ববর্তী সকল রাধা চরিত্রের চেয়ে ব্যতিক্রমী হয়ে কামনা-বাসনাপূর্ণ মানবী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন। তাই প্রিয়-বিহনে উভয় রাধার বিরহই অত্যন্ত প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু যুগভেদ, সংস্কার-চেতনার রূপান্তর এবং কাব্য রচয়িতাদ্বয়ের স্বতন্ত্র পঠনপাঠনের প্রতিফল হিসেবে তাঁদের বর্ণিত রাধা চরিত্রদ্বয়ের অনুভূতি ও ক্রিয়াশীলতা অনেকাংশে পৃথক।

## সহায়কপঞ্জি


উপল তালুকদার (২০০৯)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন: কাব্যপাঠ ও জিজ্ঞাসা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

ওয়াকিল আহমদ (১৯৯৪)। *মধ্যযুগে বাংলা কাব্যের রূপ ও ভাষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

গোলাম মুরশিদ (২০২৩)। *মাইকেলের জীবন ও পত্রাবলী*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা

গোলাম মুরশিদ (২০২৪)। *মাইকেলের দু শো বছর*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা

তপেন্দ্র নারায়ণ দাশ (২০২৩)। *মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে ইতিহাসচেতনা*। কলকাতা: নান্দনিক

নীলরতন সেন (২০০৪)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন* প্রথম খণ্ড (সম্পাদিত)। কলকাতা: সাহিত্যলোক

নীলিমা ইব্রাহীম (?)। *বাংলার কবি মধুসূদন*। ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান

নীলিমা ইব্রাহীম (১৯৯৬)। *শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপাঠের ভূমিকা* (সম্পাদিত)। ঢাকা: সময় প্রকাশন

বড়ু চণ্ডীদাস (২০১৬)। *বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র* (অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

বিকাশ পাল (২০২৪)। 'মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা পাঠ পরিক্রমা', *কৃত্তিবাস* (দ্বিশতবর্ষে মধুসূদন), বর্ষ ৯ সংখ্যা ৪-৫। কলকাতা

মধুসূদন দত্ত (২০০৯)। *মধুসূদন রচনাবলী* (ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত)। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ

মুহম্মদ আবদুল জলিল (১৯৮৬)। *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী সমাজ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

যোগীন্দ্রনাথ বসু (১৯৯৩)। *মধুসূদন দত্তের জীবনচরিত*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

রফিকউল্লাহ খান ও সৌরভ সিকদার (২০১৯)। *মেঘনাদবধ কাব্য* (সম্পাদিত)। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

শম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (২০১১)। *মধ্যযুগের ধর্মভাবনা ও বাংলা সাহিত্য*। কলকাতা: অক্ষর প্রকাশনী

শশিভূষণ দাশগুপ্ত (১৩৯৬)। *শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ: দর্শনে ও সাহিত্যে*। কলকাতা: এ মুখার্জী এ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

সুদীপ বসু (২০২৩)। 'মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা': সমকালে এবং কালোত্তরে', *মধুসূদন* (তাপস ভৌমিক সম্পাদিত)। কলকাতা: কোরক